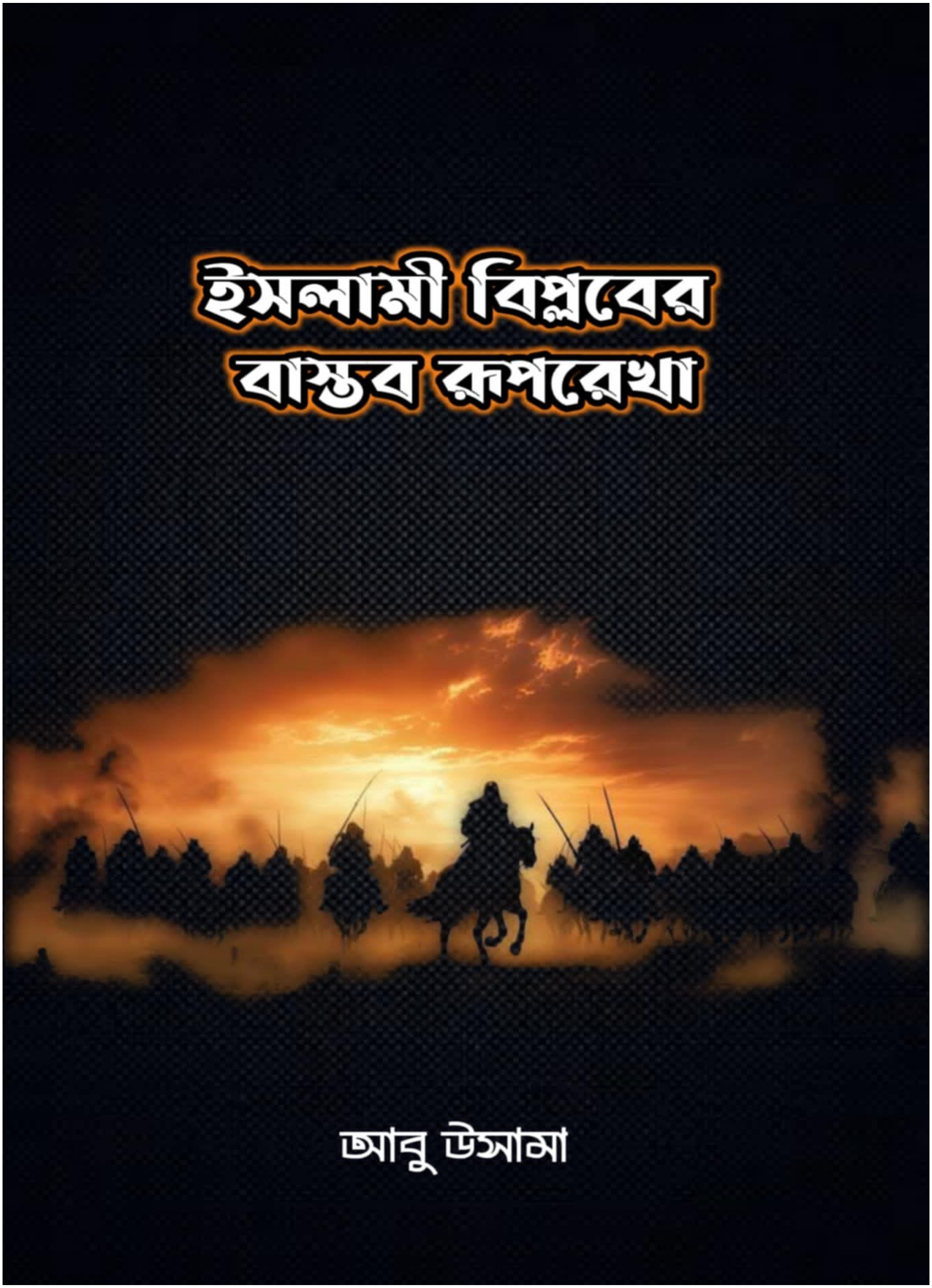
ইসলামী বিপ্লবের
বাস্তব রূপরেখা
আবু উসামা

সূচীপত্র

১. একক আদর্শিক নেতৃত্ব ও বিকেন্দ্রীক গোপন কাঠামোর অনিবার্যতা..০৩

২. জনগণ এবং নেতৃত্বশীলদের সেতুবন্ধনকারী ভ্যানগার্ড বাহিনীর উপস্থিতি সফল বিপ্লবের পূর্বশর্ত............০৬

৩. নেতৃত্বপর্যায় থেকে প্রতিবিপ্লবীদের বিভাজনমূলক ষড়যন্ত্রের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানানোর প্রস্তুতি মজুদ রাখা...০৯

৪. প্রতিপক্ষের প্রোপাগান্ডা সমূহের মজবুত অপনোদন মজুদ রাখা...১১

৫. ইসলামী বিপ্লবের বাস্তব রূপরেখা...................১৩

একক আদর্শিক নেতৃত্ব ও বিকেন্দ্রীক গোপন কাঠামোর অনিবার্যতা

ইসলামী বিপ্লবের আবেগ-আকাঙ্ক্ষা কেবল বক্তৃতার মাধ্যমে, লেখনীর মাধ্যমে, সভা-সমাবেশের মাধ্যমে বাস্তবায়নযোগ্য নয়। বরং এর পেছনে থাকা চাই সুগভীর তাত্ত্বিক ভিত্তি, আদর্শিক ঐক্য, কৌশলগত দূরদৃষ্টি এবং একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ, বিকেন্দ্রীক অথচ সমন্বিত কাফেলার কাঠামো। আজকের বৈশ্বিক বাস্তবতা ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট এ ধারণাকেই আরও স্পষ্ট করে তুলছে।

■ আদর্শিক নেতৃত্বের জরুরত :

প্রথম ও প্রধান বাস্তবতা—বিপ্লবের নেতৃত্বদানকারীদের অবশ্যই আদর্শিকভাবে সুদৃঢ় হতে হবে। নেতৃত্ব কেবল জনপ্রিয়তার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়না, এটি একটি ঈমানি ও কৌশলগত দায়িত্ব। ইসলামী বিপ্লবের নেতৃত্ব গড়ে উঠবে এমন এক আদর্শের ভিত্তিতে, যার মূল ভিত্তি হলো ইমারাহ, শরিয়াহ এবং খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা। এটি হতে হবে নববী মানহাজভিত্তিক, অর্থাৎ দা'ওয়াহ, ই'দাদ এবং জিহাদের সমন্বয়ে পূর্ণ সিরাতি পদ্ধতির অনুসরণ।

আজকে যারা নেতৃত্বে আসতে চান, তাদের সকলেই বিভক্ত—সুন্নি, আহলে হাদীস, কওমি, বা অন্যান্য ঘরানায়। প্রত্যেকেই চায় তার ঘরানার মুরব্বিগণ নেতৃত্ব পাক। ফলে আমরা আদর্শিক ঐক্যের পরিবর্তে বিভাজন তৈরি করছি। অথচ আমাদের প্রয়োজন একক আদর্শ, একক টার্গেট। আর এ ঐক্য গড়ে উঠবে তখনই, যখন নেতৃত্ব হবে চিন্তায়, কর্মপন্থায় ও কৌশলে নববী সিরাত-নির্ভর।

■ নেতৃত্বের কৌশলগত কাঠামো: গোপন ও বিকেন্দ্রীক :

বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা মুসলমানদের এমন এক নজরদারি ও দমন-পীড়নের যাঁতাকলে রেখেছে, যেখানে প্রকাশ্য নেতৃত্ব প্রায়শই ধ্বংস হয়, সংগঠন ভেঙে পড়ে, নেতারা হয় কারারুদ্ধ বা নিহত। বাস্তবতাই শেখায়—আজকের যুগে নেতৃত্বকে হতে হবে গোপন ও বিকেন্দ্রীক।

গোপন নেতৃত্ব মানে এই নয় যে সে নিষ্ক্রিয় বা দায়িত্বহীন। বরং মূল নীতিনির্ধারণ, কাঠামো গঠন, দিকনির্দেশনা সে প্রদান করে থাকে দৃঢ় গোপনীয়তার সঙ্গে। প্রকাশ্য

নেতৃত্ব থাকে তারই অধীনে, শত্রুপক্ষের দৃষ্টি এড়াতে এবং জনস্রোতের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে।

যেমন আমরা দেখেছি—আফগান ইমারাতে প্রথমদিকে মোল্লা আব্দুল গণি বারাদার হাফিজাহুল্লাহ ছিলেন আলোচনার কেন্দ্রে, কিন্তু শরীয়াহ শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পর প্রকৃত নেতৃত্বে আসেন আমিরুল মুমিনিন হিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা হাফিজাহুল্লাহ। ঠিক এমনই একটি গঠন কাঠামো আমাদের প্রয়োজন।

প্রত্যেক সেক্টরে—অর্থনীতি, চিকিৎসা, টেকনোলোজি, মিডিয়া, শিক্ষা, দা'ওয়াহ, সামরিক প্রস্তুতি ইত্যাদিতে গড়ে উঠবে দক্ষ নেতৃত্বসম্পন্ন দায়ী ইউনিট, যারা বিকেন্দ্রীক কাঠামোতে কাজ করবে, কিন্তু অভিন্ন আদর্শিক চেতনায় ঐক্যবদ্ধ থাকবে। এসব ইউনিট পরস্পর কানেক্টেড থাকবে মাল্টিলেয়ারড নেটওয়ার্কে, যেখানে শুরা পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত হবে, কিন্তু চেইন-অফ-কমান্ড হবে অপ্রকাশ্য ও লুকায়িত।

■ কৌশলগত বাস্তবতা ও সশস্ত্র প্রস্তুতির প্রয়োজন :

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে গণআন্দোলন, রাজপথের হুংকার কিংবা গণতান্ত্রিক রাজনীতির মাধ্যমে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা কেবল আবেগ নয়, তা আদতে আত্মপ্রবঞ্চনা। পাশ্ববর্তী হিন্দুত্ববাদী ভারত এক চরম ইসলামবিদ্বেষী শক্তি; আমাদের অভ্যন্তরে রয়েছে মুরতাদ সামরিক বাহিনী, সেকুলার সাংস্কৃতিক নাস্তিক্যজোট ও তাগুতি জুডিশিয়াল কাঠামো। কোনো গণঅভ্যুত্থানই শেষ পর্যন্ত 'শান্তিপূর্ণ' থাকবে না। তখন দরকার হবে সশস্ত্র প্রস্তুতি—যা অনেক ইসলামপন্থীর মধ্যেই আজ অনুপস্থিত।

এই প্রেক্ষাপটে 'Savagery Management Policy'—অর্থাৎ অরাজকতা, নিরাপত্তাহীনতা, ও সহিংস পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য গোপন কাফেলাবদ্ধ শক্তি গড়ে তোলা একান্ত আবশ্যক। দেশব্যাপী মসজিদভিত্তিক, আদর্শিক ও সংগঠিত কাফেলা প্রয়োজন, যারা শুধু দা'ওয়াত নয়, বরং নৈরাজ্যকালে উম্মাহকে রক্ষা ও নেতৃত্ব দেওয়ার সক্ষমতা অর্জন করবে।

■ নেতৃত্ব ও কাফেলার নৈতিক ভিত্তি :

গোপন নেতৃত্ব নিয়ে যে বিদ্বেষ, ব্যঙ্গ বা সন্দেহ দেখা যায়, তা মূলত আত্মঘাতী মানসিকতা। যারা আজ দুনিয়ার নানা প্রান্তে বিজয়ের পতাকা তুলে ধরছেন, তাদের

বেশিরভাগই নিরব, অপ্রকাশ্য, লেখনী ও চিন্তায় নেতৃত্বদানকারী গুরাবা। তাদের সম্মান করা, অনুসরণ করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের সাথে সমন্বয় করা আবশ্যিক দায়িত্ব।

তবে মনে রাখতে হবে—লক্ষ্য যেন এক থাকে: আল্লাহর দ্বীন কায়েম। মতপার্থক্য থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু তাচ্ছিল্য, দলাদলি, উপহাস ও অহঙ্কার কাজের বরকত কেড়ে নেয়। বিপ্লবী সেই কাফেলা যেন হেফাজতে ইসলামের মতো রাজপথে থেমে না যায় কিংবা ইখওয়ানের মতো গণতন্ত্রে গলা ডুবিয়ে আত্মহত্যা না করে—এই বোধ ও বাস্তবতা থাকতে হবে নেতৃত্ব কাঠামোর প্রতিটি স্তরে।

ইসলামী বিপ্লব কোনো অবাস্তব কল্পনা নয়, যদি তা বাস্তবতার মাটি ছুঁয়ে চলে। আমাদের প্রয়োজন এক আদর্শে ঐক্যবদ্ধ একক নেতৃত্ব, বিকেন্দ্রীক কাঠামো, গোপন কাফেলা, বহুমাত্রিক প্রস্তুতি ও শুরার ভিত্তিতে পরিচালিত একটি সশস্ত্র, দা'ওয়াতি, চিন্তাশীল, সংগঠিত কাফেলা—যারা যুগের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করে যাবে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের লক্ষ্যে।

বিপ্লবের দামামা তখনই বাজবে, যখন আমাদের সে কাফেলা থাকবে, সেই নেতৃত্ব থাকবে, সেই প্রস্তুতি থাকবে, সেই সিরাতি মানহাজের অনুশীলন থাকবে।

জনগণ এবং নেতৃত্বশীলদের সেতুবন্ধনকারী ভ্যানগার্ড বাহিনীর উপস্থিতি সফল বিপ্লবের পূর্বশর্ত

একটি আদর্শিক ইসলামী বিপ্লবের কেন্দ্রবিন্দু কখনোই কেবল বাগ্মীতা কিংবা বুদ্ধিবৃত্তিক লেখনী হতে পারেনা। বরং তা এমন এক কাঠামোর উপর স্থিতিশীল হয়, যার কেন্দ্রে থাকে সমন্বিত, বিকেন্দ্রিক, আদর্শিকভাবে পরিপক্ক গোপন নেতৃত্ব, আর প্রান্তে থাকে ভ্যানগার্ড বাহিনী— যারা জনতার সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়ে বিপ্লবের বারুদ ছড়িয়ে দেয়। এই ভ্যানগার্ড বাহিনী হবে নেতৃত্বদানকারীদের অনুগত, আদর্শিকভাবে মজবুত, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, ত্যাগে অভ্যস্ত এবং কৌশলগতভাবে প্রস্তুত এক বাহিনী, যারা জনগণকে নিছক শ্রোতা এবং পাঠকের স্তর থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে বিপ্লবি সেনানী এবং ইসলামী বিপ্লবের সক্রিয় সমর্থকে পরিণত করতে ভূমিকা রাখবে।

এই কাফেলার ভেতরে প্রতিটি দায়িত্বশীলকে তার প্রকৃত যোগ্যতা অনুযায়ী স্থানায়ন করতে হবে। কেবল বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা যেমন কারো নেতৃত্বের চেয়ারে বসার জন্য যথেষ্ট নয়, তেমনি কেবল উম্মাহর আবেগকে আন্দোলিত করতে পারলেই নীতিনির্ধারণী মজলিসে বসার যোগ্যতা জন্মায় না। প্রতিটি সেক্টরে উঠিয়ে আনতে হবে দক্ষ, নির্ভরযোগ্য, তাকওয়াবান এবং বিপ্লবী চেতনায় উজ্জীবিত কর্মী— যারা গোপন কাঠামোর সুরক্ষা বজায় রেখে সামনে থেকে কিংবা ছায়ার আড়াল থেকে কাফেলাকে এগিয়ে নিতে পারবে।

এই কাঠামোর কেন্দ্র হবে গোপন হলেও ভ্যানগার্ড বাহিনীর মাধ্যমে জনতার ভেতর ইসলামী বিপ্লবের আদর্শিক আবেদন সৃষ্টি করা অত্যন্ত জরুরি একটি ধাপ। তারা জনগণের মাঝে ইসলামি আদর্শের আকর্ষণ তৈরি করবে, শূন্য আত্মা সম্পন্ন নিষ্ক্রিয় জনতাকে রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৈনিকে পরিণত করে আল্লাহর রাস্তায় সক্রিয় করে তুলবে এবং দ্বীন এবং উম্মাহর অস্তিত্ব রক্ষায় এক নির্ভরযোগ্য বিশ্বাসযোগ্যতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করবে একে অপরের প্রতি।

তবে এর পাশাপাশি বাস্তবতাটাও আমাদের বুঝতে হবে— শুধু আদর্শিক দাওয়াতী মেরুকরণ নয়, এই কাফেলাকে সুরক্ষা দিতে হবে বাস্তব ‘মাসেল পাওয়ার’-এর মাধ্যমে। কারণ তাগুতি শক্তি কখনোই ইসলামপন্থিদের আধিপত্য অর্জনের প্রক্রিয়া

মেনে নেবে না— তা সে স্বৈরাচারী রাষ্ট্রব্যবস্থা হোক কিংবা গণতন্ত্রের মুখোশধারী ধর্মবিদ্বেষী কাঠামো। আমরা দেখেছি, কীভাবে আলেমদের জেলে পুরে রাখা হয়েছে, ইসলামপন্থীদের সকল যৌক্তিক, নিরীহ, প্রকাশ্য অ্যাকটিভিজমকে ‘মব সন্ত্রাস’, 'ভ্যান্ডালিজম' বলে তকমা দেওয়া হয়েছে।

এই দমন-পীড়নের লক্ষ্য দুটো :

প্রথমত, ইসলামপন্থিদের অকার্যকর করে রাখা ;

দ্বিতীয়ত, জনগণকে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা।

এই বিচ্ছিন্নতার একটি বড় কৌশল হলো—আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক প্রপাগান্ডার মাধ্যমে জনগণের চেতনায় সফট সেকুলারিজম ঢুকিয়ে দেওয়া। ধর্মকে ‘ইবাদাহ’ থেকে নামিয়ে এনে ‘সাংস্কৃতিক আয়োজনে’ পরিণত করা। ঈদের মতো পবিত্র দিবসকে উৎসবে রূপান্তর করে তাতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় হারাম কর্মকাণ্ড—বাদ্যযন্ত্র, ফ্রি মিক্সিং, শিরকি কার্যক্রম। এরপর সেটাকে মিডিয়া ও সংস্কৃতির নামে এমনভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়, যেন জনগণ বুঝতেই না পারে—তাদের ঈমান ও আদর্শিক শিকড় কীভাবে কেটে ফেলা হচ্ছে।

এটাই আমেরিকান মডেলের সেকুলারিজম—যা সরাসরি ধর্মকে অস্বীকার করে না, বরং তার কার্যকারিতা, প্রভাব ও নেতৃত্বকে খর্ব করে দেয়। তারা চায় এক ‘নিরীহ ইসলাম’—যে ইসলাম প্রতিবাদ করে না, নেতৃত্ব চায় না, রাষ্ট্র গঠন করে না, কেবল ব্যক্তিগত অনুশীলনে সীমাবদ্ধ থাকে। এই আদর্শিক 'সফট' আগ্রাসনের পেছনে রয়েছে এক গভীর ষড়যন্ত্র—যার মাধ্যমে জনগণের মাঝে ইসলামি আন্দোলনের প্রতি অবিশ্বাস, ভয় এবং নিরাপত্তাহীনতা ছড়িয়ে দেওয়া হয় ; ইসলামী বিপ্লবকে চরমপন্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

এমতাবস্থায়, আমাদের ভ্যানগার্ড বাহিনী কেবল জনসংযোগকারী, দাওয়াহ প্রচারকারীই হবে না—তারা থাকবে চূড়ান্ত সংঘাতের জন্য প্রস্তুত, ঈমানি দৃঢ়তায় বলীয়ান এবং মানহাজে নববীর সশস্ত্র কৌশল দ্বারা প্রশিক্ষিত। এটি কোনো বিকল্প

নয়—বরং এটি একটি ফরজ প্রস্তুতি, ই'দাদের অংশ। কারণ, হিন্দুত্ববাদী শত্রু এবং জায়নবাদী তাগুতী বিশ্বব্যবস্থা এবং তার দোসরদের মাধ্যমে আগত সংঘাতের রূপরেখা ইতোমধ্যেই নির্ধারিত। তারা সংঘাত আরোপ করবে, অপবাদ দেবে, যুদ্ধ বাধাবে—এটি অনিবার্য।

একবিংশ শতকের ৪র্থ প্রজন্মের গেরিলা ওয়ারফেয়ার বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত হলো—জনসমর্থন এবং নিরাপত্তা সম্বলিত সঙঘবদ্ধ আদর্শিক কাঠামো। এই কাঠামো ছাড়া ইসলামী বিপ্লব কল্পনাও করা যায় না।

অন্যথায়, হাশরের ময়দানে আমরা কী জবাব দেবো? আমরা কি বলবো, "তাগুতের শক্তি বেশি ছিল", নাকি বলবো, "আমরা প্রস্তুত ছিলাম না"?

নেতৃত্বপর্যায় থেকে প্রতিবিপ্লবীদের বিভাজনমূলক ষড়যন্ত্রের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানানোর প্রস্তুতি মজুদ রাখা

বিপ্লব কোনো সরলরৈখিক প্রক্রিয়া নয় ; এটি একাধিক স্তরের, একাধিক মাত্রার, বিচিত্র মানসিক প্রেক্ষাপট ও অভ্যন্তরীণে চাপের ধারাবাহিক আঘাত সমূহের সমন্বয়ে রচিত জটিল গতিপথ। আর এই ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে উত্তরণের অন্যতম প্রধান শর্ত হচ্ছে—বিপ্লবকালীন প্রতিটি সংকট, মতপার্থক্য ও বিভ্রাট নিজেদের মধ্যেই তাৎক্ষণিকভাবে সমাধান করা। কারণ, যখন বিপ্লবকালীন মুহূর্তে উদ্ভূত যেকোনো সংকট সমাধানের দায়বদ্ধতা নিজ নেতৃত্ব কাঠামোর অভ্যন্তরে না থাকে, তখন সংগ্রামের ফসল সহজে চলে যায় প্রতিবিপ্লবীদের হাতে।

উদাহরণস্বরূপ, জুলাই অভ্যুত্থান, যা ছিল আওয়ামী ফ্যাসিবাদ নির্মূলের এক অগ্নিগর্ভ অধ্যায়— তার সূচনা থেকে চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত যে কয়টি শক্তি সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিল, তাদের মধ্যে আসিফ নজরুল সহ আরও অনেকেই ছিল নেতৃত্বের কেন্দ্রে। তাদের তৎকালীন ভূমিকাকে অবজ্ঞা করা যাবে না। তারা ছিল রাজপথের সামনের কণ্ঠস্বর, জালিমের জুলুমে পিষ্ট জনগণকে আশার বাতি দেখানো কিছু মুখ।

ক্ষমতায় যাওয়ার পর কারা আসলেই বিপ্লবের প্রতি অনুগত আর কারা স্বার্থান্বেষী প্রতিবিপ্লবীদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল, তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে বিপ্লব পরবর্তী তাদের রাজনৈতিক বিভিন্ন সিদ্ধান্তের মাধ্যমে। প্রতিবিপ্লবীদের কারণে বিপ্লবের ফসল বেহাত হলে বিপ্লবীরাই সবচেয়ে বেশি সমালোচিত হয়।

হাজারো ছাত্র-জনতার রক্ত মাড়িয়ে ক্ষমতার মসনদে আরোহণ করা নব্য ক্রুসেডার ড. ইউনুস নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারেরই একটি অংশ আওয়ামী জাহিলিয়াতের আমূল নির্মূল নয় বরং, অপরাধী-নিরপরাধী শ্রেণিবিন্যাসের মাধ্যমে আংশিক পুনর্বাসনের ইঙ্গিত দেয়। ওয়াশিংটনের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী এক "স্ক্রিপ্টেড বিচারিক কার্যক্রম" উপস্থাপন করে জনগণের সাথে করা হচ্ছে প্রতারণা।

সাথে করে ফ্যাসিবাদ বিরোধী জুলাইয়ের ঐক্যবদ্ধ অবস্থানকে নেতৃত্বপর্যায় থেকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে আরেক ফ্যাসিবাদ কায়েম করা হচ্ছে। ক্ষমতার পালাবদলকে ক্রমেই জটিল করে ফেলে দেশকে এক অনিবার্য গৃহযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

এর চেয়েও বিপজ্জনক সত্য হলো— ক্ষমতালোভী প্রতিটি রাজনৈতিক শক্তি ট্র্যাডিশনাল মুসলিম ও ফান্ডামেন্টাল ইসলামিস্টদের মধ্যে বিরোধ তৈরি করে ইসলামী চেতনাকে কেবলই ভোট-জোটের পণ্য হিসেবে ব্যবহার করতে চায়।

এই বাস্তবতা আমাদের সামনে কঠোর কিছু শিক্ষা হাজির করে :

১। বিপ্লবের নেতৃত্ব কাঠামোকে হতে হবে জবাবদিহিতামূলক, আদর্শিক বৈপরীত্যমুক্ত, স্বনির্ভর ও তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম।

২। বাহ্যিক আক্রমণের চেয়েও ভেতরের ফাটল বিপ্লবকে ধ্বংস করে দেয় বেশি।

৩। বিপ্লবকালীন প্রতিটি বিচ্যুতি, আদর্শিক বিপর্যয় ও নীতিভ্রষ্টতা— তা যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন, তাৎক্ষণিক সমাধান না হলে তা গোটা বিপ্লবকে ব্যর্থ করে দিতে পারে।

বাস্তবতা হলো— ইসলামপন্থীদের উচিত ছিল জুলাই আন্দোলনের সময় বিপ্লবি ছাত্র-জনতার পাশে সহযোদ্ধা নয় বরং অভিভাবকসুলভ ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া। কিন্তু, নানা গঠনগত দুর্বলতা, কৌশলগত সংকোচ, সেক্যুলার-ডেমোক্রেটদের নেতৃত্বের প্রতি অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা এবং প্রস্তুতির ঘাটতির কারণে রাজপথে তারা সেই রূপে হাজির হতে পারেননি।

প্রতিপক্ষের প্রোপাগান্ডা সমূহের মজবুত অপনোদন মজুদ রাখা

শত্রুপক্ষ কখন আপত্তি তোলে? যখন তাদের আশঙ্কা হয়— বিপ্লব সত্যিই সফল হতে যাচ্ছে। কেননা, বিপ্লব মানেই আমূল পরিবর্তন আর আমূল পরিবর্তনের মানে, তাদের গড়ে তোলা তাগুতি সাম্রাজ্যের ভিত নড়ে যাওয়া।

তাই যারা আদর্শিক নেতৃত্বে আছে, তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হলো— শত্রুর সম্ভাব্য আপত্তি সমূহের মজবুত অপনোদন প্রস্তুত রাখা। যেন ইসলামী বিপ্লবের ন্যায্যতার বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ প্রোপাগান্ডা চালানোর পূর্বেই তার শক্তিশালী প্রত্যুত্তর মানুষের হৃদয়ে পৌঁছে যায়।।

কোনো কাফেলা যদি সত্যিই ইসলামী বিপ্লবের মাধ্যমে মানবরচিত জীবনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের সংকল্প গ্রহণ করে, তাহলে তার প্রথম শর্ত হলো— নেতৃত্ব ও সাধারণ জনতার মধ্যে একটি সুস্পষ্ট আদর্শিক অ্যালাইনমেন্ট গড়ে তোলা। কিন্তু সেকুলার-ডেমোক্রেটরা তা কখনোই হতে দেবে না। ইসলামপন্থিদের জনসমর্থন নস্যাতের মাধ্যমে বিপ্লবী কাফেলা থেকে জনগণকে বিচ্ছিন্ন রাখার জন্য তারা নানা ধরনের ট্যাগবাজী শুরু করে— ‘র‍্যাডিক্যাল’, ‘জঙ্গি’, ‘জামাতি’, 'চরমপন্থী', 'মব সন্ত্রাসী', ‘তালেবানপন্থী’, ‘উগ্রবাদী’ ইত্যাদি।

পুরো প্রপাগাণ্ডার যুদ্ধটি সেকুলারদের নিয়ন্ত্রণে থাকায় অনলাইনে যান্ত্রিক স্ক্রিনগুলোতে কুফফারদের জয়জয়কার। মুজাহিদদের সপক্ষে মিম্বার গুলোও নির্জীব মুর্দার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ায় কুফফারদের মিডিয়া প্রোপাগান্ডাগুলোই হয়ে ওঠে সত্যের মাপকাঠি।

আমরা এমন এক সামরিক যুগে প্রবেশ করেছি যেখানে শত্রু ট্যাংক নিয়ে আসে না, সে অনুপ্রবেশ ঘটায় আমাদের হৃদয় এবং মননে। আমাদের চিন্তাবৃত্তিয় জগতের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাই যেখানে শত্রুর মূল লক্ষ্য। এটি পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধনীতি— যেখানে অস্ত্র নয়, তথ্য-উপাত্ত হয়ে উঠেছে ধ্বংসাত্মক মিসাইল। মিডিয়া, সোশ্যাল নেটওয়ার্ক, কনটেন্ট প্রোডাকশন, মিথ্যা ন্যারেটিভ, ট্রেন্ডিং কনটেন্ট, দরবারী মুফতীর ডিজিটাল ফতোয়া— এসবই শত্রুর অস্ত্রাগারের একেকটি মারণেয় অস্ত্র।

এ যুদ্ধে কেউ নিহত হয় না, কিন্তু সত্য-মিথ্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রে চিন্তাচ্যুতি ঘটে। কেউ বন্দি হয় না, কিন্তু তার আক্বিদা বিকৃত হয়ে যায়। কেউ গুলিবিদ্ধ হয় না, কিন্তু তার ঈমানী চেতনা নিঃশব্দে রক্তাক্ত হয়ে অসাড় হয়ে পড়ে।

ইসলামপন্থীদের উচিত জবাবদিহিতামূলক আদর্শিক কাফেলা গড়ে তোলা, যারা এই চিন্তার লড়াইয়ে সক্রিয় ভূমিকা রাখবে।

১। মিডিয়া ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে প্রো-অ্যাকটিভ থাকা।

২। কুফফারদের উৎপাদন করা ন্যারেটিভের শক্তিশালী অপনোদন প্রস্তুত রাখা।

৩। তরুণ প্রজন্মের চিন্তাশীলতা এবং ইসলামী আক্বিদার বুনিয়াদকে সেক্যুলার-ডেমোক্রেটদের আগ্রাসনের হাত থেকে রক্ষা করা।

৪। নেতৃত্ব ও জনতার মাঝে দ্বীনি ঐক্যের সেতুবন্ধন গড়ে তোলা।

৫। পূর্ণাঙ্গ বিপ্লবের জন্য ইসলামপন্থীদের ময়দানের চতুর্থ প্রজন্মের গেরিলা ওয়ারফেয়ারের পাশাপাশি পঞ্চম প্রজন্মের মিডিয়ার রণক্ষেত্রেও সক্রিয় হওয়া জরুরি।

ইসলামী বিপ্লবের বাস্তব রূপরেখা

জিহাদের ফরজিয়্যাত আদায়ের ক্ষেত্রে শরীয়তের মুকাল্লাফ ব্যক্তি, ভূমি নয়। সুতরাং, সমরনীতি বিবেচনায় কোনো ভূমিতে ক্বিতালের উপযোগিতা নির্ধারণের বিষয়টি উক্ত ভূখণ্ডের মুসলিম অধিবাসীদের জিহাদের ফরজিয়্যাত আদায়ের শরঈ জিম্মার সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়।

আবেগপ্রসূত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ক্বিতালের জন্য কোন ভূমির উপযোগিতা নির্ধারিত হয়না। বরং, তাগুতি শত্রুর মোকাবেলায় উম্মাহর শক্তিমত্তার ভারসাম্যের অসমতাকে বিবেচনায় নিয়ে গেরিলা পদ্ধতিতে জিহাদী আন্দোলনকে তার চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছে দিতে সক্ষম— এমন কিছু মৌলিক উপদানের উপস্থিতির ভিত্তিতে কোনো ভূমিতে ক্বিতালের উপযোগিতা নির্ধারণ করেন সমরকৌশলে পারদর্শী জিহাদী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ।

এক্ষেত্রে ভূখণ্ডগুলোকে দুইটি শ্রেণিতে বিভাজন করা হয়—

১। ক্বিতালের ভূমি বা জিহাদের অগ্রবর্তী ভূমি এবং

২। নুসরতের ভূমি বা সাপোর্টিং ভূমি বা সেকেন্ডারি ভূমি।

এই শ্রেণিবিভাগ নিছক কৌশলগত কোনো তত্ত্ব নয়, বরং এটি জিহাদী মানহাজে এক অপরিহার্য নীতিমালা, যা সঠিক সময়ে সঠিক ভূমিতে জিহাদের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে।

সহজেই নির্ণয়যোগ্য এবং অনস্বীকার্য ইসলামবিরোধী আগ্রাসী তাগুতি শক্তির উপস্থিতি, যার প্রতিরোধে উম্মাহর নিঃসংশয় সমর্থন ; নিরবচ্ছিন্ন লজিস্টিক সাপোর্ট ; জনস্রোতের নিরাপদ আশ্রয়ে 'হিট অ্যান্ড রান' পলিসির মাধ্যমে জিহাদী অপারেশন পরিচালনার সুযোগ ; ঘন পাহাড়ি বনাঞ্চলের উপস্থিতি, যেখানে তাগুতি শক্তির নিয়ন্ত্রণ সীমিত ; দুর্বল সীমান্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ; কাঁটাতারের ওপারে মুজাহিদদের সহযোগী এক বা একাধিক প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বিদ্যমানতার ভিত্তিতে কোন ভূমিকে জিহাদ-ক্বিতালের জন্য অগ্রবর্তী ভূমি হিসেবে নির্ধারণ করা হয়।

অপরদিকে, যেই ভূমিগুলোতে ইসলামবিরোধী শক্তির দৃশ্যমান আগ্রাসন উপস্থিত থাকে না, বরং বুদ্ধিবৃত্তিক শোষণ এবং নিয়ন্ত্রণের জাল ছড়ানো থাকে, তাগুতি শক্তির তল্পিবাহক রাষ্ট্রকাঠামোর নিশ্ছিদ্র নজরদারি বিদ্যমান, সেই ভূমিগুলো সরাসরি

ক্বিতালের ভূমি হিসেবে বিবেচিত না হয়ে ক্বিতালের সহযোগী ভূমি হিসেবে বিবেচিত হয়।

যুদ্ধবিধ্বস্ত ভূখণ্ডের অধিবাসীদের আর্থিক এবং মানবিক সহায়তা পৌঁছানো ; ক্বিতালরত আল্লাহর সৈনিকদের পক্ষে সমর্থন সৃষ্টি করা, তাদের ক্বিতালের কার্যক্রমের সহযোগী প্রযুক্তিগত, সামরিক, আর্থিক, কূটনৈতিক সহায়তা পৌঁছানো ; নিরাপত্তার বজায় রেখে ক্বিতালের ভূমিতে হিজরতের ফিকির করা, মুজাহিদদের জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আনসারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া— নুসরতের ভূমির অধিবাসীদের শরঈ জিম্মা।

এই জিম্মাদারি সুষ্ঠু রূপে সম্পাদনের মাধ্যমে সাপোর্টিং ভূমিগুলোতে তাগুতি শক্তির বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের স্বরূপ উন্মোচিত হয়ে আদর্শিক মেরুকরণ এবং সামাজিক শক্তি অর্জনের প্রক্রিয়া যেমন সম্পন্ন হয়, তেমনি করে আধুনিক বহুমাত্রিক যুদ্ধনীতি বিবেচনায় রেখে ই'দাদের ফরজিয়্যাতও আদায় হয়ে যায়। ফলে, এই ভূমিগুলোতে ইসলামবিরোধী তাগুতি শক্তি একটা পর্যায়ে যেয়ে স্বশরীরে অথবা প্রক্সি বাহিনী ব্যবহার করে প্রকাশ্য সামরিক আগ্রাসন চালাতে বাধ্য হয়, যা এই ভূমিগুলোকে সরাসরি ক্বিতালের ভূমিতে পরিণত করে।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বাংলাদেশ আদতে ক্বিতালের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ভূমি হিসেবে বিবেচিত না হলেও, ক্বিতালের সহযোগী ভূমি হিসেবে অবশ্যই বিবেচিত হবে।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে এই ভূখণ্ডে হিন্দুত্ববাদী শক্তি কিংবা জায়নবাদী পশ্চিমা শক্তির দৃশ্যমান আগ্রাসন বিদ্যমান না থাকলেও সেক্যুলার হেজেমনির মাধ্যমে ঠিকই তাগুতি শক্তির বুদ্ধিবৃত্তিক শোষণ এবং নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত আছে। আর গনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় মূলত তাগুতের এই বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনকেই রাষ্ট্রীয় ভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। 'অখন্ড ভারত' এর স্বপ্নচারী হিন্দুত্ববাদী শক্তি এবং জায়নবাদী পশ্চিমা শক্তির যৌথ আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে এই ভূখণ্ডে আদর্শিক মেরুকরণ যত জোড়ালো হবে, এই ভূমিতে তাগুতি শক্তির সামরিক আগ্রাসনের বৈধতাও তত দৃশ্যমান হবে, যা একটা পর্যায়ে যেয়ে এই ভূমিকে ক্বিতালের অগ্রবর্তী ভূমিতে পরিণত করবে।

এছাড়াও ভারতের সেভেন সিস্টার্স অঞ্চলের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান গুরুত্বপুর্ণ ভারতীয় পররাষ্ট্র এবং প্রতিরক্ষা নীতিতে আলাদা

গুরুত্ব বহন করে। সুতরাং, এই ভূমিতে ইসলামী বিপ্লবের বাস্তবতা সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের দ্বীনী জাগরণের প্রেক্ষিতে বিচ্ছিন্ন কোনো কর্মপরিকল্পনার অংশ নয়।

তাই ভূ-রাজনীতি সম্পর্কে বাস্তবিক বুঝ সম্পন্ন যে কারও কাছেই এই ভূমিতে দ্বীন এবং উম্মাহর অস্তিত্ব ও ধারাবাহিকতা রক্ষায় জিহাদ-ক্বিতালের যৌক্তিকতা অস্বীকারের সুযোগ নেই।

বিপ্লব তথা তাগুতি রাষ্ট্রকাঠামোর আমূল পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে আদর্শিক মেরুকরণের ভিত্তিতে সৃষ্ট নিরস্ত্র গণআন্দোলন ভিত্তিক কর্মপন্থার উপর অধিক নির্ভরশীলতা তাগুতি শক্তিকে এই ধরণের দ্বীনী অন্দোলন সমূহের সফলতার সম্ভাবনাকে সীমিত করে ফেলার সুযোগ করে দেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ধরনের দ্বীনী আন্দোলন সমূহের নেতৃত্ব প্রকাশ্যে থাকায় তাগুতি শক্তিকে এই দ্বীনী আন্দোলন সমূহকে প্রভাবিত এবং নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগও করে দেয়। গণআন্দোলন ভিত্তিক এই ধরণের দ্বীনী আন্দোলন সমূহ প্রকৃত অর্থেই জিহাদী মানহাজের বিপরীতে তাগুতি শক্তির নিয়ন্ত্রিত প্রতিপক্ষে পরিণত হয়।

তাই, উম্মাহর হাজার বছরের জিহাদ-ক্বিতালের সিয়াসি তাওয়ারুস পরিহার করে কেবল আদর্শিক মেরুকরণের ভিত্তিতে সৃষ্ট গণজাগরণকে কাজে লাগিয়ে তাগুতি শক্তির সামরিক বাহিনীর মোকাবেলা সম্ভব নয়, ফলে কাঙ্খিত বিপ্লব বাস্তবে পরিণত হয়না। উপরন্তু উম্মাহর বিপ্লবী চেতনা ব্যর্থতার চক্রে আবদ্ধ হয়ে পড়লেও উম্মাহ সেটি উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়না। এছাড়াও যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া ব্যতীত নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনার অনুশীলনের সুযোগ পাওয়া সম্ভব নয় আর নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনার দক্ষতা অর্জন ব্যতীত রাষ্ট্রকাঠামোর নিয়ন্ত্রণ নেওয়া সম্ভব নয়, যা আদতে পুরো দ্বীনী আন্দোলনের ফসলকেই বেহাত করে দেয়।